বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ৩০ তম বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়

এম এম আকাশ*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে পোশাক শিল্পের অবদান প্রায় ৭৭ শতাংশ। নীট রপ্তানি আয় হিসাব করলে (অর্থাৎ আমদানিকৃত কাঁচামালের অংশ বাদ দিলে) তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশে (যদি আমরা ধরে নেই যে মোট রপ্তানি মূল্যের ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় আমদানিকৃত কাঁচামাল তথা কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানির জন্য) তবে একসময় পোশাক শিল্পে প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল আমদানি ব্যয়। মাত্র ২০ শতাংশ মূল্য সংযোজন দিয়ে এই পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে এ শিল্পকে ঘিরে ধীরে ধীরে নানা ধরনের সংযোগ শিল্প গড়ে উঠেছে। তবু অনুমান করা হয় যে, বর্তমানে গড়ে মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ পুনরায় বাইরে চলে যায়। ২০ শতাংশ মূল্য সংযোজন দিয়ে শুরু করে ত্রিশ বছরে (১৯৮০ থেকে ২০১০ সময়কালে) ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজনে পৌঁছানোর প্রবণতাটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

পোশাক শিল্পের প্রধান দুটি খাত রয়েছে: ওভেন খাত ও নীটওয়্যার খাত। নীটওয়্যার খাতের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রমবর্ধমান হারে দেশে তৈরি হচ্ছে এবং এজন্য নীটওয়্যার রপ্তানিতে মূল্য সংযোজন অপেক্ষাকৃত বেশি। ২০০৫ সালে কোটা উঠে যাওয়ার পর যেহেতু এ দেশের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানির কাঠামো ক্রমাগত নীটওয়্যার খাতের দিকে ঝুঁকছে, সেহেতু মোট রপ্তানিতে নীটওয়্যার খাতের উৎপাদনের অংশও বাড়ছে। ফলে পোশাক শিল্পের মোট রপ্তানিতে আমদানির অংশও হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন যে, সাম্প্রতিককালে গড়ে পোশাক শিল্পের মোট উৎপাদনে আমদানিকৃত কাঁচামাল বিশেষ করে কাপড়/সুতার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ সব মিলিয়ে ৫০ শতাংশ বা তার নিচে নেমে গেছে। একথা সত্য হলে, পোশাক শিল্পের মূল্য সংযোজন দাঁড়ায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ এবং মোট রপ্তানিতে নীট রপ্তানির অংশ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ! দেশের মোট রপ্তানিতে ৭৭ শতাংশ বা নীট রপ্তানির ৪৬ শতাংশ কোনোটিই অনুলেণ্ঢখযোগ্য নয়।

পোশাক শিল্প অত্যন্ড় শ্রমঘন এবং প্রধানত মহিলারা এই শিল্পে নিয়োজিত আছেন, যা শিল্পখাতে মোট নিয়োজিত শ্রমিকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। চলতি হিসাবে দাবি করা হয় যে, এই শিল্পে প্রায় ৩০-৪০ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। বিবিএস-এর একটি অনুপুংখ হিসাব এর ভিত্তিতে ২০০৪ সালে এসব শ্রমিকের পেশা-লিঙ্গ-আবাসন বিন্যাসের একটি চমৎকার চালচিত্র পাওয়া যায়। হিসাবটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে আইএলও কর্তৃক প্রকাশিত "আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি, পোস্ট এমএফএ রেজীম এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক" [R.M.G. Industry: Post MFA Regime and Decent Work] শীর্ষক গ্রন্থের পরিশিষ্ট-খ এ। একটি সম্যক ধারণার জন্য নিচের তালিকায় এর উলেণ্ঢখযোগ্য তথ্য-পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরা হলো।

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ প্রবন্ধটি আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতা ফান্ড, বিআইডিএস আয়োজিত তৃতীয় আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতায় লেখক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ।

পোশাক শিল্পে অথবা এ শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৯ ধরনের পেশা লক্ষ করা যায়। বোঝার সুবিধার জন্য এসব পেশার মূল ইংরেজি নামই নিচে উলেণ্ঢখ করা হলো:

1. Textile Fiber Preparation
2. Spinners and Winders
3. Weaving and Knitting Machine Setters and Pattern Card Preparation
4. Weavers
5. Knitters
6. Bleachers, Dyers and related Textile Finishers
7. Spinners, Weavers, Knitters, Dyers and related Workers, not Classified Elsewhere
8. Pattern Makers and Cutters
9. Sewers and Embroiderers.

বিবিএস এর হিসাব থেকে আরও জানা যায়-

- এসব পেশায় ২০০৪ সালে প্রায় ১৮ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল।
- এসব শ্রমিকের মধ্যে ৩৮ শতাংশ পুর"ষ শ্রমিক ও ৬২ শতাংশ মহিলা শ্রমিক। নিটিং কাজটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও ভারি বিধায় সেখানে পুর"ষ শ্রমিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পক্ষান্ড়রে সেলাই ও এমব্রয়ডারিতে নিয়োজিতদের প্রায় ৮০ শতাংশই মহিলা শ্রমিক। কিন্তু সব মিলিয়ে এই শিল্পে মহিলা শ্রমিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমশক্তি।
- এই শিল্পের (মহিলা+পুর"ষ) শ্রমিকদের মধ্যে ৩৫ শতাংশের বাড়ি শহরে অর্থাৎ শহরেই তাদের স্থায়ী ঠিকানা এবং ৬৫ শতাংশ শ্রমিকের স্থায়ী ঠিকানা গ্রামে এবং গ্রামের সঙ্গে তাদের রয়েছে নিবিড় ও ঘনিষ্ট যোগাযোগ।

সুতরাং শহর ও গ্রামের নিম্নবিত্ত বিশাল এক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য এই শিল্পের বিশেষ গুর"ত্ব রয়েছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় এবং ইন্টারনেটে প্রচলিত বিভিন্ন ওয়েবপেজে এই শিল্পের গুর"ত্ব বোঝানোর জন্য যেসব চলতি সূচক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

- মোট জিডিপিতে এই খাতে উৎপাদন মূল্যের অবদান প্রায় ৫ শতাংশের সমান।
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মোট সংযোজিত মূল্যে পোশাক শিল্পের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ।
- এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার সমগ্র শিল্প খাতের অন্য সব শিল্পের চেয়ে বেশি। সুতরাং এই শিল্প প্রথম থেকেই সমগ্র শিল্প খাতের নেতৃত্বদানকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত। একমাত্র সিমেন্ট শিল্প

ও ঔষধ শিল্পই প্রবৃদ্ধির হারের মাপকাঠিতে এ শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। ইদানীং জাহাজ শিল্প দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, এসব নেতৃত্বদানকারী শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা রপ্তানিমুখী শিল্প। সুতরাং বিশাল বিশ্ববাজারের কারণে এসব শিল্পের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম। স্থানীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা এদের প্রবৃদ্ধির লাগাম টেনে রাখতে পারে না। তবে এরা শ্রমঘন শিল্পও বটে এবং শ্রমের দাম বাংলাদেশে খুবই সস্তা বলে এসব শ্রমঘন পণ্যের ক্ষেত্রে এসব শিল্পের একধরনের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও বিদ্যমান।

- তবে র‍্যাডিকেল অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন এ ধরনের শিল্পের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর এক ধরনের সচেতন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত শ্রমঘন, নোংরা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো তারা হয় প্রবাসী শ্রমিকদের দ্বারা নিজের দেশে সম্পন্ন করার কৌশল গ্রহণ করেছে অথবা এসব বিশেষ ধরনের শিল্পের অবস্থানকে তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে এসব প্রান্তিক দেশ চিরকাল সস্তায় শ্রমঘন পরিবেশ-প্রতিকূল ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যগুলো তৈরি করবে এবং কেন্দ্রগুলোতে তা রপ্তানি করবে। তদুপরি শুধু এ সব শিল্পের বাজার নয় উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও উন্নত ধরনের প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী পণ্যগুলোর জন্যও এসব দেশকে চিরকাল কেন্দ্রগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। এতে এসব দেশের শিল্পায়ন কখনোই উন্নত দেশের মতো পুঁজিঘন শিল্পায়নের স্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা স্থায়ীভাবে নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ শ্রমঘনত্বের ফাঁদে আটকে থাকবে। ফলে তাদের শিল্পগুলো অধিকাংশই হবে "sweat shop" বা "footloose industry"।

২। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব

বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীন ইত্যাদি দেশের শিল্পায়নের অভিজ্ঞতা উপরোক্ত হতাশাবাদী চিত্রটিকে কিছুটা প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। লেখক নিজের অতীত মতটিকেও এই নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা উচিত বলে মনে করেছেন। "পুঁজিবাদী পথে বিকাশ অসম্ভব" বা "অপুঁজিবাদী পথে বিকাশের সম্ভাব্যতা"-র অতীত তত্ত্ব দুটিকে অন্তত পুনরায় খুঁটিয়ে পরীক্ষার সময় এসে গেছে।

১৯৮২ সালে লেখক তার লিখিত "পরনির্ভরশীল পুঁজিবাদের মডেল ও বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন "প্রথমত, শ্রমনির্ভর দ্রব্য রপ্তানির নীতি গ্রহণ করলে সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন চক্রান্তের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে একটি দেশ চিরকালের জন্য শ্রমনির্ভর এবং উৎপাদনের পশ্চাৎপদ অঞ্চলে পরিণত হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই বিপদ খুবই প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার দ্রব্যের মোট আমদানি ব্যয়ের ৩৩ শতাংশই ব্যয়িত হয়েছে জ্বালানির জন্য। আবার এসব আমদানি দ্রব্যের দাম যে হারে বাড়ছে সে হারে রপ্তানির দাম বাড়ছে না ফলে তাদের রপ্তানি শিল্প বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। সস্তা মজুরের তুলনামূলক সুবিধা যন্ত্রপাতি, কেমিকেল ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দামের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে কোরিয়ার বস্ত্র শিল্প। কোরিয়ার বস্ত্র শিল্পে ১৯৭৩-৭৪-এর আগে (অর্থাৎ জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি ও তদনুসৃত পুঁজিবাদী বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতির আগে) মোট উৎপাদন খরচের ৫০ শতাংশই ছিল সস্তা মজুরদের মজুরি তহবিল। কিন্তু বর্তমানে মোট খরচে মজুরির অংশ হচ্ছে মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ।

সুতরাং কোরিয়া পড়েছে শাঁখের করাতে-তাকে বস্ত্র শিল্পকে ঠেলে পুঁজিনির্ভর রূপে সুসজ্জিত করতে হচ্ছে আবার তার ফলে তার সস্ড়া শ্রম নির্ভর পণ্য রপ্তানির যে বাজার অতীতে ছিল তা আংশিকভাবে হারাতে হচ্ছে। নতুন বিশ্বমূল্য পরিস্থিতিতে এসব দেশকে শ্রম-নির্ভর প্রযুক্তি থেকে পুঁজিনির্ভর প্রযুক্তিতে যেতে হয় অথচ সাম্রাজ্যবাদী শ্রমবিভাজন এখন আর তার অনুমতি দিচ্ছে না (এম এম আকাশ, বাংলাদেশের অর্থনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,প্যাপিরাস ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৩)।"

১৯৮২-এর এই লেখার পর প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ড় হয়েছে। এই সময়ে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য নিয়ে নেহের্র মতো প্রথমেই পুঁজিঘন আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পসমূহ পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে নির্মাণ করে জাতীয়তাবাদী শিল্পায়ন নীতি ধরে এগোনোর সুযোগ এখন অনেক বেশি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তদুপরি তদানীন্ড়ন ভারতসহ ঐ ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে অপুঁজিবাদী পথে অগ্রসরমান দেশগুলোও এখন "ট্র্যাক" বা রাস্ড়া পরিবর্তন করে শ্রমঘন রপ্তানিমুখী শিল্পের দিকে হাঁটতে শুর্ করেছে। চীনও অনেকদিন ধরে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ দুই পায়ে হাঁটার নীতি অনুসরণ করছে। অর্থনীতিবিদরা চীনের এই সফল কৌশলকেই সঠিক বলে মনে করেন। একে ইংরেজিতে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা যায়: "Selective Combination of Import Substitution and Export Combination," অর্থাৎ শ্রমঘন এবং পুঁজিঘন উভয় কৌশলই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একই সময়ে গ্রহণযোগ্য। দেং এর ভাষায়, আগের মতো বিড়াল কালো না সাদা তা দেখলে চলবে না। যখন যে বিড়াল ইঁদুর মারতে পারবে তখন সে বিড়ালটিকেই পুষতে হবে—এটাই হবে কৌশলগত বাণিজ্যের মূল কথা।

অভিজ্ঞতা আরও দেখিয়েছে, অনেক দেশই একপেশেভাবে সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প গড়তে গিয়ে দেশের আয় বণ্টন আরও অসম করে ফেলেছে, বেকারত্ব বৃদ্ধির পাশপাশি নানারকম ভর্তুকি ও লোকসানের ভার বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্ম হয়েছে অদক্ষ মাথাভারি প্রশাসন ও অদক্ষ শিল্পের। আবার অন্যদিকে যেসব দেশ নিজেদের শ্রমিকদের শিক্ষিত করতে পেরেছে, শৃঙ্খলার মধ্যে এনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পেরেছে, শ্রমিক-মালিক-সরকারের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম জীবনধারণ মান অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে পেরেছে তাদের পক্ষে ধাপে ধাপে শ্রমঘন রপ্তানি থেকে পুঁজিঘন ও দক্ষতা নির্ভর শিল্প ও উন্নত পণ্য তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। রপ্তানিমুখী ও আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছে তারা। কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে একদিকে স্থানীয় বাজারের প্রসার ঘটেছে অন্যদিকে রপ্তানির প্রসারও অব্যাহত রয়েছে। কোনো কোনো দেশ পণ্য বা সেবা নয়, সরাসরি দক্ষ মানবসম্পদ রপ্তানি করে প্রচুর ধন-সম্পদ/অর্থ উপার্জন করছে। বিশ্ব-অর্থনীতিতেও ক্রমে ক্রমে এসব দেশ তাদের প্রান্ড়িক অবস্থান পরিবর্তন করে মাঝারি আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং সেই সম্ভাবনা ক্রমশ আংশিক বা পরিপূর্ণ দৃশ্যমান বাস্ড়বতার রূপ নিচ্ছে। যদিও এই পথের পদে পদে প্রচুর বাধা বা প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে।

এই নতুন সম্ভাবনাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে একটি রূপকের মাধ্যমে। একে বলা হয়েছে "Flying Geese Model"। এই মডেল অনুযায়ী ভবিষ্যৎবাণী করা হয় যে, সবচেয়ে উন্নত দেশগুলো ক্রমাগত অধিকতর পুঁজিঘন পণ্য রপ্তানিতে ঝুঁকবে, ফলে ঠিক তাদের নিচে যে দেশগুলো আছে তারা তাদের শূন্যস্থান দখল করে নিতে সক্ষম হবে এবং এইভাবে নিচের সারির দেশগুলো একে একে পরবর্তী

ধাপে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে। তবে প্রথম এবং দ্বিতীয় সারির দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বে দ্বিতীয় সারির দেশগুলোর বিজয় এবং একধাপ উপরে ওঠার মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়ার "Multiplying Effect" চালু হতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশের উপরে যে দেশগুলো রয়েছে, যেমন চীন ও ভারত, তারা যদি নিচে নেমে বাংলাদেশের সঙ্গে সস্ড়া পোশাক উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তা হলে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় সারির দেশগুলোর পক্ষে এই মডেলের উত্তরণ ঘটানোর সম্ভাবনা কমে আসবে বা নাকচ হয়েও যেতে পারে। কিন্তু এ কথা এখনই কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না যে, সবচেয়ে শ্রমঘন নিম্নস্ড়রের পোশাক উৎপাদক বাংলাদেশ কি কোটা ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার পর উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে নিজের জন্য এক ধাপ উঁচুতে বিশেষ একটি স্থান বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে নাকি নিচু উৎপাদনেই আটকে থাকবে নাকি আরও নিচে নেমে গিয়ে সংকটে জর্জরিত হয়ে পরবে।

হতাশাবাদীরা আশঙ্কা করেছিল যে, ২০০৫ সালে "এমএফএ" উঠে যাওয়ার পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সংকটে পড়বে। বিশেষ করে ২০০৮ সালের পর চীনের সঙ্গে যখন আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের লড়াই করে টিকে থাকতে হবে তখন বাংলাদেশ হেরে যাবে, বাজার হারাতে থাকবে এবং পুরো পোশাক শিল্পে সংকট ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। তা কি আসলেই হয়েছে? পরিসংখ্যান বলে অদ্যাবধি তা হয়নি। ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে গড়ে আমাদের দেশের পোশাক শিল্পের মোট রপ্তানি মূল্য প্রতিবছর ১৭.৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০১০-১১ এর প্রথম নয় মাসের যে হিসাব অর্থনৈতিক জরিপে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, গত বছরের প্রথম তুলনীয় ৯ মাসের রপ্তানির তুলনায় মোট রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ। আর নীটওয়্যার খাতে ঐ একই সময় রপ্তানি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৪৪ শতাংশ এবং ওভেন খাতে তা হয়েছে ৩৮ শতাংশ। তবে উন্নত বিশ্বে মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হলে এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধি না পেলে এই প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না!

৩। কোটাশূন্য পৃথিবীতে পোশাক শিল্প

২০০৫ সালের ২৪ আগস্ট পোশাকশিল্পের মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ এবং সরকারপক্ষ একটি ত্রিপাক্ষিক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল: "Enhancing Employment, Global Competitiveness through Decent Work: Post M.F.A. Challenges and Opportunities." পরবর্তীতে "RMG Industry Post MFA Regime and Decent Work: The Bangladesh Perspective" শীর্ষক একটি গ্রন্থে ওই সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলী ও আলোচনার ধারা বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। ২০০৬ সালে আইএলও এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত উলেণ্ডখযোগ্য সিদ্ধান্ড় ও তথ্যগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো:

(ক) শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষা (যেমন- বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃত্ব সেবা, বিনোদন, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি) খুবই নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এগুলোর আরও উন্নতি ঘটাতে হবে।

(খ) মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে, বাংলাদেশে কোটা পদ্ধতির বিলুপ্তি পর ওভেন খাতে অবনতি হলেও কোটামুক্তির কারণে নীটওয়্যার খাতে অগ্রগতি হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পোশাক শিল্পখাতে উৎপাদন ও কর্মনিয়োজন কমেনি। তবে বৃদ্ধির হার প্রথমে কিছুটা হ্রাস পেলেও তা পুনরায়

দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। মালিকদের মতে, তাদের কারখানাগুলোতে বাধ্যতামূলক দাস শ্রম অথবা শিশু শ্রম নেই। মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে একই শ্রমের জন্য একই মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে "Branded Item" বা উন্নত মানের পোশাক প্রস্তুতকারক বড় কারখানাগুলোর পক্ষে শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থাগুলো যে মাত্রায় দেয়া সম্ভব, ছোট কারখানাগুলোর পক্ষে সে মাত্রায় তা দেয়া সম্ভব হয় না। উলেণ্ঢখ্য যে, এখন পর্যন্ড় বিপুল সংখ্যক কারখানাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা। কোনো কোনোটি আবার বড় কারখানার "Subcontractor" হিসেবে কাজ করছে।

(গ) সাধারণভাবে কোটামুক্ত প্রতিযোগিতার কারণে পোশাকের রপ্তানিমূল্য কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু তার ফলে পোশাক শিল্প অলাভজনক হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না। তবে মালিকরা কি আরও মজুরি কমিয়ে নতুনভাবে সমন্বয় করে মুনাফা ঠিক রেখে অগ্রসর হবে নাকি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদনের বহুমুখীকরণ ঘটিয়ে আরও উন্নত প্রবৃদ্ধি ও উন্নততর মজুরির দিকে যুগপৎ অগ্রসর হবে— এই প্রশ্নটি ওই ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভায় জোরালোভাবে বিভিন্ন পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়।

(ঘ) তিন পক্ষই স্বীকার করে নেয় যে, বর্তমান উন্মুক্ত বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য চারটি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে হবে:

(১) পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

(২) পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখা। অর্থাৎ পণ্যের দাম সহজে বৃদ্ধি করা যাবে না।

(৩) লিড টাইম কমানো তথা অর্ডার নেয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্ডার সাপণ্ঢাই নিশ্চিত করা।

(৪) আন্ড়র্জাতিক শ্রমমান ও ডিসেন্ট ওয়ার্ক এর "Standard" মেনে চলা। বিশেষ করে উন্নত দেশের ক্রেতারাসহ সারা বিশ্বেই এখন শ্রমিকদের জন্য "compliance"-এর যে কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত করা। তা না পারলে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে নিম্নমানের শ্রমঘন পণ্যগুলো থেকে বের হয়ে "Branded Item" ধরতে পারবে না।

(ঙ) ত্রিপক্ষীয় সভা থেকে এটাও স্বীকার করে নেয়া হয় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ কারখানাতেই "Social Compliance" অনুপস্থিত। এর কারণগুলো চিহ্নিত করা হয় যথাক্রমে:

(১) এখনো কমপণ্ঢায়েন্স স্টান্ডার্ডগুলো কি মালিক কি শ্রমিক উভয় পক্ষের অধিকাংশেরই অজানা রয়েছে।

(২) "Brand Item" ক্রেতারা যারা সাধারণত কমপণ্ঢায়েন্স এর জন্য চাপ দেন তাদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোট ও মাঝারি কারখানার কোনো যোগাযোগ নেই।

(৩) অনেক কারখানার কমপণ্ঢায়েন্স রক্ষা করার মতো অবকাঠামোগত ও আর্থিক সক্ষমতা নেই।

(৪) কমপণ্ঢায়েন্স রক্ষার জন্য সরকারের শ্রম বিভাগ থেকে তদন্ড় ও নিয়মিত মনিটরিং এর যে উদ্যোগ থাকা দরকার তা অনুপস্থিত। যদি কখনো কোনো গোলমাল ধরা পরেও, তা নিরসনে চাপ প্রয়োগ বা শাস্ড়ির ব্যবস্থা এখনো খুব দুর্বল।

(চ) অবশ্য সকল পক্ষই শেষ পর্যন্ড় একমত হন যে, এই শিল্পকে "ঘামের দোকান" বানিয়ে রাখা চলবে না। শ্রমিকদের জন্য কাজের পরিবেশ উন্নত করতে হবে, শ্রমিকদের ভালভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এটা ছাড়া শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি করা যাবে না এবং বাজারে প্রতিযোগিতাতে ভালোভাবে টিকে থাকা যাবে না।

(ছ) শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এই ত্রিপক্ষীয় সভায় ৩টি দাবির উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়:

(১) প্রত্যেক শ্রমিককে অফিসিয়াল নিয়োগপত্র প্রদান করতে হবে।

(২) শ্রমিকের মজুরি যথাযথ করতে হবে এবং তা নিয়মিত প্রদান করতে হবে। সুতবাং বর্ধিত ন্যূনতম মজুরির দাবীটি জর"রি দাবী হিসেবে উত্থাপিত হয়। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভালো যে, ন্যূনতম মজুরির পরিমাণটি প্রকৃত অংকে নির্ধারিত না হলে এবং মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে মজুরি নিয়ে শ্রমিক অসন্ড়োষের আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব হতেই থাকবে।

(৩) আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের যে ধারাগুলো বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে সেগুলো কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে:

(ক) কনভেনশন ২৯ (বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা)।

(খ) কনভেনশন ৮৭ (সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা)।

(গ) কনভেনশন ১০০ (সমান কাজের জন্য সমান মজুরি)।

(ঙ) কনভেনশন ১৮২ (শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ)।

তবে শ্রমিকরা সর্বাধিক গুর"ত্ব আরোপ করেন কনভেনশন ৮৭-এর উপর অর্থাৎ সংগঠন গড়ার স্বাধীনতার উপর।

এই ত্রিপক্ষীয় সভার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, "কোটাশূন্য প্রতিযোগিতা" বিষয়টিকে শুধু একটি হতাশা এবং সংকটের বিষয় হিসেবে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিরা দেখছেন না। তারা এটাকে দেখছেন একটি নতুন চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় এজেন্ডা হিসেবে। যদি বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে করণীয়গুলো দ্র"ত সম্পন্ন করতে পারে এবং পোশাক শিল্পে শান্ড়ি বজায় রেখে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে তাহলে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু যদি এদেশের পুঁজিপতিরা লোভী কৃষকের মতো স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী রাজহংসটিকে মেরে একবারে বেশি ডিম পাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এই শিল্পে তখন ঝগড়া-বিবাদ-নৈরাজ্য ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। এবং দেশ একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে অবহেলায় হারিয়ে ফেলবে।

৪। করণীয় প্রসঙ্গ

পোশাক শিল্পে মালিকদের একটি নির্বাচিত সংস্থা রয়েছে। লেখকের চলমান গবেষণার সূত্রে তাদের ওই সংস্থার একজন প্রাক্তন সভাপতির একটি সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল। সেখানে তিনি যে করণীয়গুলোর কথা বলেছিলেন সেটি দিয়েই শুর" করা যাক।

প্রথম তিনি বলেছিলেন যে, ওভেন খাতে এখনো পুরোপুরি স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার সম্ভব নয়। সেটা করাটাও খুবই ব্যয়বহুল। অতটা পুঁজিঘন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের ক্ষমতাও অধিকাংশ উদ্যোক্তার নেই। কিন্তু নীট খাতের কাঁচামালের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ আমরাই তৈরি করতে সক্ষম। একটু চেষ্টা করে এটাকে শতভাগে উন্নীত করা সম্ভব। সেটা করার জন্য উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

আমাদের বর্তমান এলডিসি স্ট্যাটাস ইউরোপের বাজারে জিএসপি সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত প্রবেশের ক্ষেত্রে আমাদের অনুকূলে সাপে-বর হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এ সুবিধা চিরস্থায়ী হবে না। তাই দীর্ঘমেয়াদি টেক্সটাইল শিল্প গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

চীন, ভারত বা ঐ ধরনের দেশগুলো সবচেয়ে শ্রমঘন রপ্তানি পোশাকগুলোর ক্ষেত্রে অন্ড়ত আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে পারবে না কারণ আমাদের শ্রমিক সরবরাহ পর্যাপ্ত এবং মজুরিও চীন বা ভারতের চেয়ে এখনও কম। ক্রেতারা চায় কম দাম এবং একসঙ্গে বৃহৎ পরিমাণ বা "বাল্ক সাপণ্টাই"। এই দুটো পূরণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের অনেক পরিমাণে আছে। তাই আগামী ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ড় বাংলাদেশের পোশাকের বাজার নিয়ে ভাবতে হবে না। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মাঝারি আয়ের দেশ যেমন চীন, মালয়েশিয়া, ভারত ইত্যাদি বাজারেও বাংলাদেশের পোশাক সন্ড়া হওয়ার কারণে রপ্তানি হচ্ছে।

উন্নত দেশগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসব দেশ প্রথমে তৈরি পোশাক শিল্প দিয়ে শুর" করেছিল। দ্বিতীয় ধাপে তারা বস্ত্র শিল্প গড়ে তুলেছে। সব শেষে গিয়ে মেশিন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের সামনেও ওই একই পথ খোলা রয়েছে।

তবে এই পথে এগুনোর জন্য কতকগুলো অনুকূল নীতি সমর্থন দরকার এবং সেগুলো হচ্ছে:

(ক) অনুকূল ভৌত অবকাঠামো: বন্দর, রাস্ড়াঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সুবন্দোবস্ড়।

(খ) ব্যাংকের সুদের হার হ্রাস করে প্রতিযোগী দেশগুলোর সমান করা। প্রতিযোগী দেশগুলো তাদের সমধর্মী খাতকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, সেসব সুযোগ-সুবিধা আমাদের সরকারকেও দিতে হবে।

(গ) পোশাক শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের অভাব পূরণের জন্য উপজেলায় উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। তা নাহলে ইতোমধ্যেই এই খাতে দক্ষ শ্রমিকের যে ঘাটতি লক্ষ করা যায়-তা আরও প্রকট হবে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা অন্য দেশের শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক, সেটি পরিবর্তনের জন্যও প্রশিক্ষণ ও নতুন যন্ত্রের প্রয়োজন।

(ঘ) পোশাক শিল্পের জন্য আলাদা ইপিজেড স্থাপন ও প্রয়োজনীয় জমি বা এলাকা বরাদ্দ করা দরকার।

মালিকদের পাশাপাশি লেখক প্রখ্যাত শ্রমিক নেতার সাথেও আলাপ করেছিলেন। তার পরামর্শগুলোও এখানে উলেণ্টখ করা হলো:

(ক) ২০০৬ সালে নির্ধারিত মাসিক ১,৬৬২ টাকা নিম্নতম মজুরি কোনোক্রমেই শ্রমিকদের জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। ২০১০-এ এসে শ্রমিকদের দাবি ছিল মাসিক ৫,০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি করা। তখন সরকার ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করে ৩,৩২০ টাকা করেন। এইভাবে

শিল্পখাতটি নৈরাজ্য ও ধ্বংসের হাত থেকে তখনকার মতো রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু অসন্তোষ তখনো পুরোপুরি মিটেনি। দ্রব্যমূল্যের সাথে সাথে বাড়ি ভাড়া বাড়তে থাকলে মালিকরা এই মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন না। এ বিষয়ে সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে আবার শিল্পে অশান্তি ও সংকট দেখা দিতে পারে।

(খ) এই অবস্থায় মালিকদের হয় মুনাফার হার কমিয়ে শ্রমিকদের উচ্চতর মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে অথবা সরকারকে এগিয়ে এসে শ্রমিকদের জন্য সস্তায় রেশন ও স্বল্প ভাড়ায় বাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

(গ) এই মুহূর্তে সরকারের কাছে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে সরকার প্রচলিত আইন অনুসারে পোশাক শিল্পের মালিকদের মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জন্য আদায় করে নিতে পারেন এবং সেটা দিয়ে শ্রমিকদের শুধু রেশন ও বাসস্থান নয় উপরন্তু শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন। ২০০৯-১০ সালে পোশাক শিল্পের মোট রপ্তানি আয় ছিল ১২৪৯৬.৭২ মিলিয়ন ডলার। আমরা যদি ধরে নেই যে, এর ৭৫ শতাংশই ব্যয় হয়েছে মধ্যবর্তী উৎপাদন খরচ খাতে, তাহলে ঐ বছর পোশাক শিল্প খাতে মোট মূল্য সংযোজনের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩১২৪.১৮ মিলিয়ন ডলার। আমরা যদি এটাও ধরে নেই যে, সংযোজিত মূল্যের ৮৮ শতাংশ ব্যয় হয় শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট সংশিণ্টষ্ট অন্যান্য খরচ বাবদ, তাহলে মালিকদের হাতে ঐ বছর জমা মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় মূল্য সংযোজনের ১২ শতাংশ বা মোট মূল্যের ৩ শতাংশ অর্থাৎ ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার। এই মুনাফার ৫ শতাংশ হচ্ছে ১৮.৭৫ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান বিনিময় হারে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৫১ কোটি টাকা। এই প্রাক্কলনের পূর্বানুমানগুলো পোশাক শিল্পের মালিকদের সর্বোচ্চ কনসেশান দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ডায়ালগের মাধ্যমেই প্রণীত। তাই বলা যায়, সর্বনিম্ন হিসাবেও দেখা যাচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে পোশাক শিল্প মালিকদের ঘাড়ে সম্মিলিতভাবে প্রতি বছর ন্যূনতম ১৫০ কোটি টাকা শ্রমিক কল্যাণ বাবদ ব্যয় করার অপূর্ণ দায় বিদ্যমান। এটা পূরণ করলেই উলেণ্টখিত সমস্যাগুলোর অনেকখানি সুরাহা হতে পারে।

(ঘ) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার বাংলাদেশে স্বীকৃত এবং অন্য শিল্পে তা আছে। এটা পোশাক শিল্পকেও দিতে হবে। এটা না দিয়ে "শিল্প পুলিশ" গঠন করে বা বল প্রয়োগ করে শ্রমিক দমনের মাধ্যমে এই শিল্পে শান্তি রক্ষা সম্ভব হবে না। এমনকি চেম্বার অব কমার্সের সভাপতিও স্বীকার করেছেন যে, "ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ" ব্যবস্থাটি দীর্ঘমেয়াদে কোনো টেকসই সমাধান হবে না (দেখুন দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মে, ২০১২)।

প্রবন্ধের উপসংহারে বলা যায়, এই উভয় প্রতিনিধির বক্তব্যগুলোতেই যুক্তি রয়েছে। সরকারের উচিত এগুলো গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা।